ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 114-124
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.440

অমর মিত্রের ‘ডাইন’: একটি বাস্তব ভূমিজীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দস্তাবেজ

মহেন্দ্র নাথ পাল, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 02.04.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The struggle of the indigenous people—the ‘sons of the soil’—for land rights is an eternal one. Power-hungry Jotdars (large landholders), moneylenders, and landlords have perpetually sought to strip the indigenous people of their land rights, thereby reducing them to mere agricultural laborers. By keeping the indigenous population under their absolute dominion, these landlords aim to perpetuate their imperialistic hegemony forever. At times, a blind and sordid brand of politics emerges surrounding the rights to land possession and utilization. It is precisely from the precarious socio-economic existence of those deprived of their rightful land claims that a leader eventually rises. Amar Mitra’s short story, ‘Daain’, serves as just such a socio-economic and political chronicle of this marginalized agrarian life. The narrative is set against the backdrop of the land-rich region along the banks of the Subarnarekha River, near the West Bengal–Bihar border, amidst the turbulent Naxalite upheaval of the 1970s. The story’s protagonist, Hari Nayek, fought like a ‘Son of Fire’ against the moneylenders, landlords, usurers, and Jotdars who had usurped the rights of the entire agrarian community. His very presence kept figures like Dataram Singh and Mahapatra Satapathi in a state of constant terror for a long time. Ultimately, wielding the Naxalite ideology of destroying ‘class enemies’ as their weapon, the peasant masses of the Kirtaniyashol region united under Hari Nayek’s leadership. In Hari Nayek’s voice, they discovered their dream of liberation. However, Hari Nayek’s tragic death—cut down by a bullet from Dataram Singh’s gun—threatened to plunge the lives of the local peasantry back into the jaws of terrifying uncertainty. Such an event would have allowed the domineering forces—with their menacing glares and predatory fangs—to rear their heads once again. Consequently, Hari Nayek’s wife took charge of the situation; having advised that her husband’s body be buried secretly on the banks of the Subarnarekha, she spearheaded the dissemination of a rumor: that Hari Nayek had merely gone into hiding. This stratagem ensured that the moneylenders and the power-wielding classes would, at the very least, be denied the luxury of undisturbed slumber; just as before, they would remain perpetually on edge, haunted by the apprehension of Hari Nayek’s sudden return. Standing amidst the social milieu of the 1970s, a rural woman—defying the societal norms surrounding widowhood—shouldered the responsibility of safeguarding the land and the peasantry, much like an exemplary public leader. Consequently, when she went to light a lamp at her husband’s grave on the banks of the Subarnarekha, society branded her as immoral and smeared her with the stigma of being a ‘witch’. Yet, such ignominy remained trivial to her;

for, in exchange, she had at least succeeded in saving an entire class from the clutches of aggression and terror. Amidst the Naxalite turbulence of the 1970s, author Amar Mitra's short story 'Daain' stands as a living testament to the socioeconomic and political realities of rural life.

Keywords: Sons of the Soil, The Realm of the Land-dwelling Tribes, The Banks of the Subarnarekha, Landlords, Class Enemies, The Naxalite Milieu, The Leadership of Hari Nayek, The Superstition of Witchcraft, A United Peasantry, An Exceptional Revolution and Resistance Rooted in Womanhood.

পৃথিবীর আদিম সভ্যতা থেকেই ভূমিজীবনের সঙ্গে মানুষের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। এই ভূমিজপণ্যই মানবসভ্যতাকে জুগিয়েছে বেঁচে থাকার তথা জীবনধারণের পরিসর। তাই ভৌম-দুনিয়ার সাথে মানব জাতির সম্পর্ক চিরকালীন। আধুনিক যুগবিশ্ব উন্নয়ণ ও প্রগতির ডানায় ভর করে অর্জন করেছে 'বিশ্বায়ন'-এর (Globalization) তকমা। কৃষি-শিল্প পরিহার করে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলো যতই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক না কেন; কৃষি ও ভূমিজীবনের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবী অনুভব করবে আজীবন। আর সেইজন্যই এই ভূমিজাতির রাজ্যে অধিষ্ঠিত মানুষগুলোকে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় এবং হয়েছেও বারবার। তাদের স্ব-অধিকারের দাবি চিনিয়ে দিয়েছে তাদের সংগ্রামী সত্তাকে। তারা কখনোই চায় না বিপন্ন অস্তিত্বের কাছে মাথা নোয়াতে। এ ঘটনার ধারাবাহিকতা বহমান থেকেছে সেকাল থেকে একালেও। আর এই পরিমণ্ডল থেকে বৃন্তচ্যুত হয়নি ভারতের ষাট-সত্তরের দশকও।

ভারত বরাবরই কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে নিজ অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। মহানগরীর ঝাঁ-চকচকে আলো নগর জীবনকে সম্পৃক্ত করলেও; অন্ত্যেবাসী, প্রান্তিক মানুষগুলির ভূমিজীবনের ইতিহাসটি অত্যন্ত অন্ধকারময়। সেখানে আলো পৌঁছোয় না সমৃদ্ধির। সেই কারণেই আত্মজীবন তথা ভৌম অধিকারকে টিকিয়ে রাখতে তাদের লড়াই করতে হয়েছে বারবার। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই কারণেই জমিজাতির অধিকারের দাবি একুশ শতকের আলোক-নির্ভর সভ্যতাতেও কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনের(২০০৬) মতো ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। আর বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে তো কৃষকের জীবন পরিসর অনেকটাই সংকীর্ণ। তাদের অধিকারকে তো তখন করে রাখা হয়েছে অনেক বেশি সংকুচিত। কাজেই বাঁচার তাগিদে, জীবনের দাবিতে তাদের মতো করে তাদের জীবন সংগ্রাম, ভূমি-আন্দোলন যে স্বখাতে প্রবাহিত হবে– এ ঘটনা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রান্তিক, অন্ত্যেবাসী কৃষিজীবন সেইজন্য নড়ে বসেছে বারবার। সবথেকে বড় বিষয়, এই ষাট-সত্তর দশকেই ঘটে গিয়েছিল ভারতের অন্যতম বৈপ্লবিক ঘটনা নকশালবাড়ি আন্দোলন। নামটি তার 'নকশালপন্থী আন্দোলন' হলেও, এ আন্দোলন কার্যত ছিল কৃষক বিদ্রোহ। নিজ জীবন অধিকারের দাবিতে হাজার হাজার কৃষকরা মূলত শ্রেণিশত্রু ধ্বংসের আদর্শে ব্রতী হয়েছিলেন সেদিন। আসলে ভারতের ইতিহাসে যত আন্দোলন দেখা গেছে তার সিংহভাগ জুড়েই ছিল মূলত কৃষকদের অস্তিত্ব। কারণ বৃহত্তর কৃষিভারতের বিপন্ন কৃষকস্বার্থের দায়ই কৃষিজীবী মানুষকে শামিল করে আন্দোলনে। এই নকশাল আন্দোলনও রচনা করেছিল তেমনই মোড়ক। সেখানে বুর্জোয়া, সুবিধাভোগীদের মতো শ্রেণিশত্রু বিনাশেই মানুষকে গলা তুলতে দেখেছিলাম। আর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেহেতু চিরকালই দেশ-কাল-সময়-সংকট দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে এসেছে; তাই নকশাল যুগের ভূমি আন্দোলন ও ভূমি-অধিকারের দাবিও ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করলো আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যকে। রচিত হতে লাগল একাধিক গল্প-উপন্যাস। তার সর্বাধিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের পরিধিতে এক অন্যতম কথাকার হলেন অমর মিত্র (১৯৫১-)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পরোক্ষ বিষবাষ্প তাঁর শৈশবকে আচ্ছন্ন করলেও লেখক কিন্তু বড় হয়ে উঠছিলেন ১৯৬৫-৬৮-র খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ এসবের মধ্য দিয়েই দিয়েই। কাজেই

লেখকের মনস্তত্ত্বে ব্যাপকভাবে জায়গা করে নিচ্ছিল আন্দোলন ও দাবি আদায়ের অধিকারবোধটুকু। এই নকশাল আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে লেখকের সাহিত্যসত্তাকে। তারই প্রতিফল হিসেবে গড়ে উঠেছে অমর মিত্রের 'ডাইন', 'আত্মাপাথর', 'দানপত্র'-এর মতো নকশাল প্রভাবসম্পৃক্ত গল্পগুলি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৯৭৪ সালে 'ভূমি সংস্কার কানুনগো'র বৃত্তি অবলম্বন করে অমর মিত্র কলকাতা পরিত্যাগ করে স্থানান্তরিত হলেন– মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার করন্ডা গ্রামে। আর ঠিক সেখান থেকেই শুরু হল লেখকের নগরজীবনবিচ্ছিন্ন সুদূর প্রবাস। তবে এই প্রবাস জীবনের প্রাপ্তিই পূর্ণ করে দিয়েছিল লেখকের জীবনশূন্যতাকে। তাঁর এই বিচ্ছিন্ন গ্রামপ্রবাস তাঁকে দিয়েছে গ্রামীণ, প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত, অন্ত্যেবাসী মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের অবসর। তাঁকে দিয়েছে তাদের জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু অনুভব করার মতো স্পর্শকাতর মন। এইভাবে পেশাগত কারণে ভ্রাম্যমানতার সূত্রে ব্যক্তিগত গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা লেখকের হাতকে দিয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির রসদ। প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে গূঢ়ভাবে জড়িত হয়ে অমরবাবু অনুভব করতে পেরেছিলেন তাদের আত্মসংকট। কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্বের এই গ্রামযাপনের অভিজ্ঞতাই উৎসারিত করে দিল লেখকের শিল্পরচনার উৎসমুখটি। এই প্রসঙ্গে কথাকার অমর মিত্র স্বয়ং তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকার 'অলীক এই জীবন' অংশে জানিয়েছেন–

> "শহর থেকে দূরে গিয়ে, কখনো কংসাবতী, কখনো সুবর্ণরেখা, কখনো ডুলং, তারপর হলদি নদী, বঙ্গোপসাগরের তীরে বদলি হয়ে আমার একসময় মনে হলো আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমার মতো করে এই পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছে কে? আমি বরং লিখেই যাই। আমি বরং আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাটুকু ব্যবহার করে চাষী বাসী বিপন্ন মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি।"[১]

এরপর আর লেখককে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি কোথাও। অমরবাবুর এই গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীমন দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে একের পর এক শক্তিশালী গল্প। কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের গল্পবিশ্বের পরবর্তীপর্বে নগরজীবনসম্পৃক্ত গল্পের উদ্ভাস পরিলক্ষিত হলেও, সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক পরিসর তাঁকে দিয়েছে গ্রাম জীবনের গল্প লেখার শক্তি। সেরকমই একটি ছোটগল্প হল আমাদের আলোচ্য 'ডাইন' গল্পটি।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পটি হয়ে উঠেছে লেখকের পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতাসূত্রে রচিত একটি বাস্তব ভূমিজীবনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দস্তাবেজ। ভূমি সংস্কার কানুনগোর চাকরি লেখককে চিনিয়ে দিয়েছিল আইনের ফাঁক-ফোঁকর ও গণতান্ত্রিক প্রশাসনের অন্ত:সারশূন্যতার দিকটি। লেখক দেখলেন আইনের ও প্রশাসনের রক্ষকরাই কিভাবে আইনের অপব্যবহার করে নিম্নবিত্ত হতদরিদ্র মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে জীবনের বিপ্রতীপে, তথা মৃত্যুর অভিমুখে। আসলে সত্তর দশকের সমস্ত কথাকারদের কলমেই রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধির ছাপ। তাঁরা কেউই তা থেকে বেরোতে পারেন না। অমরবাবুও পারেননি। কথাকার অমর মিত্রও যেহেতু সত্তর দশকেরই কথাকার, তাই নকশালের প্রভাব তাঁর গল্পেও ঘাঁটি গেড়েছে। আসলে 'ডাইন' গল্পটি নকশালের প্রভাবে কৃষকসমাজের একত্রিত হওয়ার গল্প। হরি নায়েকের নেতৃত্বে তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার গল্প। তাদের মাটির অধিকার ও দাবি আদায়ের গল্প। এই গল্প হয়ে উঠেছে হতদরিদ্র কৃষকদের জমিজাতির রাজ্যে মানুষের মতো করে আত্ম-অস্তিত্বে বাঁচতে চাওয়ার গল্প। তারা চেয়েছে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা। কানুনের ফাঁক গুলোকে তারা তুলে ধরতে চেয়েছে প্রশাসনিক দরজায়। ভূমির সংস্কার সাধনের দাবিতেই হরি নায়েকরা হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়াবিলাসী, সুবিধাভোগী শ্রেণিশত্রুদের বিরোধী এবং উগ্র নকশালপন্থী। প্রকৃতপক্ষে লেখকের বারবার মনে হয়েছিল তীব্রভাবে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। আসলে

কর্মজীবনের দীর্ঘ পরিসর লেখককে এই ভাবনায় উত্তরিত করেছিল। কারণ তিনি দেখেছেন সিংহভাগ জমিই তখনো হিন্দু জমিদারির অধীনস্থ। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই অসমতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি। জমির অ-সংস্করণই প্রান্তিক, অন্ত্যেবাসী মানুষগুলির পায়ে বেড়ি পরিয়েছে। সেইজন্য অমরবাবু 'ডাইন' গল্পটির মধ্য দিয়ে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়াস রেখেছেন। এই নিরিখেই মূলত 'ডাইন' গল্পটি গড়ে উঠেছে। এইবার আমরা গল্পটির একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে নেব গল্পটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভূমি জীবনের প্রত্যয়টিকে।

অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পটির ক্ষেত্রভূমিতে রয়েছে দীনদরিদ্র স্বল্পতম জমির স্বত্বাধিকারী পরিশ্রমজীবী কৃষক সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান। এই মানুষগুলি নিতান্তই সর্বহারা। মাত্রাতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমেও তারা সাংসারিক সচ্ছলতা আনতে ব্যর্থ। তারা একত্রিত হয়েছে হরি নায়েকের নেতৃত্বে। এই হরি নায়েকই তাদের কেন্দ্রীয় শক্তি। তারই সাহসবিন্দুতে ভর করে এতগুলো মানুষ স্বপ্ন দেখেছে মুক্তির। তারা স্বপ্ন দেখেছে আর্থিক বঞ্চনা ও শোষণমুক্ত এক স্বনির্ভর সৌরকরোজ্জ্বল সকালের। কিন্তু আঞ্চলিক শাসনরাজ, সামন্ততান্ত্রিক বাবুয়ানা বারবার পর্যুদস্ত করেছে এই মানুষগুলির মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণের অধিকারকে। বারবার ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছে তাদের মেরুদন্ড। সেই জমিদার ও বাবু-বুর্জোয়াবৃত্তের শৃঙ্খল ভাঙনের শরিক হয়েছে হরি নায়েক। সে সমস্ত রকমের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাবদ্ধতার প্রতিসারী। বুর্জোয়া ও বেণিয়াবৃত্তিকে সে সমূলে উৎপাটিত করতে চায় পশ্চিমবাংলার প্রান্তিক ভূগোল থেকে। আসলে ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক আবহে বঙ্গব্যাপী আছড়ে পড়া নকশাল আন্দোলনের অভিঘাত আপ্লুত করেছিল গোপীনাথপুরের কীর্তনীয়াশোল মৌজার হরি নায়েকদেরও। তাই শ্রেণিশত্রু জখমেই তার আদর্শ সিদ্ধি। এই প্রসঙ্গে গল্পকার গল্পে আমাদের জানান-

> "এ হেন হরি নায়েক তাবড় তাবড় মানুষের দুঃস্বপ্ন। হরি নায়েকের ভয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে হয় মহাপাত্রদের।"[২]

অর্থাৎ এই মহাপাত্ররা হল সুবিধা ও ক্ষমতাভোগী বুর্জোয়া জাতি। নকশালবাদের ভাষায় প্রকৃত অর্থে তারা কৃষক শ্রমিকের মতো শ্রমজীবী শ্রেণির 'শ্রেণিশত্রু'। সেইজন্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ জননেতা হরি নায়েক এই সমস্ত মানুষের বুর্জোয়াতন্ত্রকে ভাঙতে চেয়েছে। সে ভূমি-অধিকার সংক্রান্ত প্রশাসনিক আইনের দ্বারস্থ হয়েই কৃষকদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে স্ব-স্ব অধিকার। এইভাবে নকশালবাদের আবহে তারা অংশ নিয়েছে ভূমি আদায়ের দাবিতে। নকশাল বিপ্লব এখানে তাদের প্রতিরোধ শক্তির অনুঘটক হয়ে কাজ করেছে।

এই 'ডাইন' গল্পটির পটভূমি-প্রতিবেশটি গড়ে উঠেছে পশ্চিম বাংলার প্রান্তিক সীমারেখা ও বিহার রাজ্যের সংযোগ ক্ষেত্রে। বাংলার গোপীনাথপুর এলাকা ও বিহারের সিংভূম জেলার পটভূমিতেই গল্পটি নির্মিত। ভৌগোলিক অবস্থানে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী জমিজাতির রাজ্যটিই এই 'Subaltern' বা 'নিম্নবর্গীয়' মানুষগুলিকে দেয় বাঁচার রসদ। কিন্তু সিংহভাগ কৃষকদের ভাগচাষীবৃত্তির পরিশ্রম তাদের কৃষকজীবনে জ্বালিয়ে দিতে পারে না সুখের সাঁঝবাতি। ফলত স্বাভাবিভাবেই নকশাল আন্দোলনের আদর্শ ও দাবি এই ভূগোলের মানুষগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে খুব সহজেই। নিজেদের জীবনের ফাঁকি ও শূন্যতার সঙ্গে তারা মিলিয়ে নিতে পারে সেই রাজনৈতিকতার আদর্শ। যদিও এই প্রান্তিক জনজাতি মানুষগুলির এককভাবে লড়াইয়ের ক্ষমতা বা প্রতিবাদের মানসিকতা খুবই কম। কিন্তু হরি নায়েকের নেতৃত্ব ও সংগ্রামী শক্তি তাদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে প্রতিবাদী চেতনায়। ফলে তারাও শামিল হতে পারে বুর্জোয়াবাদীদের বিলাসী জীবনবৃত্তির বিপাক্ষিক মিছিলে। তারা ধ্বংস করতে চায় তাদের বেআইনি বুর্জোয়া বিলাসকে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন তাঁর 'সকলের গান' কবিতায় বলেছিলেন–

> "আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?

ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া –
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী!
অন্তত আজ মাড়াই না তার ছায়া।"[৩]

ঠিক সেইরকমভাবে হরি নায়েকের নেতৃত্বে প্রায়-ভূমিহীন, নি:স্ব, প্রান্তিক মানুষগুলিও যেন লড়াই করেছে ঐ প্রজাপতি-সন্ধানী তথা জীবনের বিলাস-সুখ সন্ধানী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। হরি নায়েকের নেতৃত্বে তারা সমূলে নাশ করতে চেয়েছে বুর্জোয়া শাসনকে। এইভাবে গল্পটিতে গড়ে উঠেছে নকশাল বিদ্রোহের প্রভাবসম্পৃক্ত এক ভূমি আন্দোলনের দাবি।

এবার এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে মানুষগুলির ভূমি অধিকারের দাবির জোরালো কারণটুকু। গল্পটির সময়কাল **১৯৭১** থেকে **১৯৭৮-৭৯** নাগাদ। অর্থাৎ সময়পর্বটি স্বাধীনতা-উত্তর কাল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থাতেও গড়ে উঠেছে একাধিক ভৌম-আইন। সেই আইন অনুযায়ী এই সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সেচ অঞ্চলে একটি পরিবারের জমির সর্বোচ্চ সীমা হতে পারে বাহান্ন বিঘার মতো। কিন্তু আঞ্চলিক বাবু-সম্প্রদায় এই আইনের ঊর্ধ্বে। এই বাবু-সম্প্রদায়ের প্রশাসনকে দেওয়া ঘুষ ও উপঢৌকন তৈরি করেছিল একাধিক আইনি-শিথিলতা। আর সেটা তাদের দিতে পেরেছিল আইন-উত্তীর্ণ নানা সুযোগসুবিধা। এইভাবে সেখানে তারা নিরঙ্কুশ বে-আইনকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয় প্রশাসনেরই সহায়তায়। 'ডাইন' গল্পেও দেখি প্রশাসনিক প্রশ্রয় মহাপাত্র শতপথীবাবুদের সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া-বিলাস ও মানুষের অধিকারহরণের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দিয়েছিল আরো কয়েক ধাপ। এ বিষয়ে গল্পকার লেখেন-

"মহাপাত্র শতপথীবাবুদের জীবন রক্ষার জন্য, বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্যই তাঁদের জন্মবৃদ্ধি এবং চাকুরিতে যোগদান।"[৪]

এ উক্তি প্রশাসন প্রসঙ্গে। যে প্রশাসনিক বিভাগের উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনের ন্যায্য দাবিগুলিকে রক্ষার দায়; সেই প্রশাসনই বে-আইনি বৃত্তির মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগীদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। ফলত একথা একরকমভাবে বলাই যায় যে, রক্ষকই ভক্ষক হয়ে এখানে হরণ করেছে হতদরিদ্র কৃষকগুলির জীবন ও অধিকারের দাবিকে। আসলে গল্পকার অমর মিত্র পেশাজীবনে ভূমি সংস্কার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতিগুলিকে। এভাবে লেখক তাঁর গল্পে একাধিক চরিত্রের সমন্বয়ে সেই নীতি-স্খালনের প্রতিবাদ জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, অমর মিত্র তাঁর 'কোকিল'(**১৯৯১**) গল্পেও সরকারি অফিসারদের ঘুষখোর বাস্তব রূপটিকে অচিন্ত্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন অসাধারণ শিল্প দক্ষতায়। ঠিক তেমনই 'ডাইন'(**১৯৮০**) গল্পেও লেখক দেখালেন– পুলিশ প্রশাসনের এই উপঢৌকনভিত্তিক জীবন, দিন-আনা দিন-খাওয়া হতদরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষদের ন্যায় বিচার ও ন্যায্য অধিকারে আঘাত হানছিল। ফলে 'ডাইন' গল্পেও এই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনিক দুর্নীতির মোড়ক– এসবই সুবিধাভোগীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। এখানকার সাধারণ মানুষ আর পুলিশ-প্রশাসনের গণতান্ত্রিক নীতির ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। ঠিক তখনই নকশাল আদর্শের আবহে গড়ে ওঠা হরি নায়েকের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ভূমি আদায়ের দাবিতে এই মানুষগুলিকে আনতে পেরেছিল এক ছাতার তলায়। এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতেই তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল নকশাল আদর্শ-সম্পৃক্ত বিপ্লবচেতনা।

হরি নায়েকের মধ্যে ছিল তীব্র ব্যক্তিত্ব। প্রচন্ড প্রতাপশালী সে। তার শৌর্য-বীর্যের তীব্রতায় স্তব্ধও হয়ে গিয়েছিল বাবুদের ক্ষমতার সাম্রাজ্যবাদ। নকশাল আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ ছিল- শোষণবৃত্তির মধ্য দিয়ে

গড়ে তোলা বুর্জোয়া ও পুঁজিপতি শ্রেণিশত্রুদের সম্পত্তি হরণ ও তাদের ব্যক্তিগতভাবে জখম-আক্রমণ। সেই আদর্শেই ভর করে হরি নায়েক নিজেদের প্রতিবাদদৃপ্ত সত্তার ঝলক দিতে পেরেছিল। আর তাই–

> "বাবুগণ হরি নায়েকের ভয়ে দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন।"[৫]

হরি নায়েকের প্রচন্ড প্রতাপ সামন্ততান্ত্রিক বাবু-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়েছিল তীব্র প্রাণভীতিবোধ। হরি নায়েক তার নিজ প্রতাপ ও শারীরিক বলিষ্ঠতায় বাবুদের সম্পত্তি হরণে কার্যসিদ্ধ হয়। আসলে ভূমি-সংস্কারের সরকারি আইনকে বেপাত্তা করে, 'দান'-এর জমি হিসেবে বাবুরা বজায় রাখতে থাকে অতিরিক্ত জমি রাখার কৌশলটি। জামাইয়ের নামে এই দানপত্র নাকি তাদের জামাই-যত্নের ঐতিহ্যবাহী সংস্কার! এ তাদের বুর্জোয়া জীবনলব্ধ 'সাপ মেরেও লাঠিটা না ভাঙা'র বিষয়ী মারপ্যাঁচ। কিন্ত প্রশাসনিক ন্যায়শাসনও সেখানে এতদিন তার নিরপেক্ষ স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সেখানে রক্ষকই থেকেছে ভক্ষকের ভূমিকাতে। উপরন্তু প্রশাসনিক বিভাগের কয়েকজন সৎকর্মীর তৎপরতাও, সেই কর্মীদের চাকরিছুট হওয়ার উপক্রম সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় অমরবাবুর 'এই চরাচর এই চালচিত্র' গল্পে আমরা দেখি, সরকারি কর্মচারীদের জমি অধিগ্রহণের ছবিকে। আসলে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কোলাজই তাঁর এধরনের গল্পের উৎসমুখ। আর এই 'ডাইন' গল্পে সরকারি কর্মচারীদের সরাসরি জমি অধিগ্রহণ না থাকলেও; বরং তারা ক্ষমতাভোগী বাবুজাতিকে জমি অধিগ্রহণের অধিকার কায়েম রাখতে সাহায্য করেছিল। তাই এই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তাই যখন ভূমি অধিকারের দাবিতে দোর্দন্ডপ্রতাপ নকশাল নেতা তৈরি করে দেয় – তখন সত্যিই কি কারো কিছু বলার থাকতে পারে? এইভাবে লেখক গল্পে জমির প্রতি হরি নায়েকের দাবি ও অধিকারবোধ জন্মানোর পটভূমিটিকে সূক্ষ্ম চিত্রণে রূপ দিলেন।

আমরা জানি যে, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দশকেই বাংলা কথাসাহিত্যে কথাকার অমর মিত্রের আবির্ভাব। সেই দশকটি হল সত্তরের দশক। যে দশক বিপ্লবের দশক, প্রতিবাদের দশক, সংস্কারসাধনের দশক এবং যে দশক আগুন, মৃত্যু ও রক্তেরও দশক বটে। আসলে মেদিনীপুরের গ্রামজীবনে অবস্থানকালে গ্রাম বাংলার মানুষগুলিকে নিবিড় পর্যবক্ষণ সহকারে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই এই ভূমি জীবনের দস্তাবেজ তিনি রচনা করতে পারেন 'ডাইন' সহ একাধিক গল্পে। গ্রামবাংলাকে গভীরভাবে ভালোবেসে এই সমস্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার দলিল হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন তাঁর গল্পগুলিকে। আর যেহেতু প্রতিবাদের দশক সত্তরেই তাঁর আবির্ভাব; সেহেতু হরি নায়েক চরিত্রদের তিনি গড়ে তুলতে পারেন তীব্র প্রতিবাদী হিসেবে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তারা গড়ে তুলতে পারে তীব্র প্রতিরোধের আখ্যান। সেইজন্যই তো হরি নায়েক তার নিজ নেতৃত্বে ও দলবদ্ধ প্রয়াসে বাবুবিলাসী সুখের পলেস্তারা খসিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত নয়। বাবুদের ক্ষমতাভোগী ব্যক্তিত্বের বিপ্রতীপে সে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করতে পারে প্রতিবাদের সুর, ঘোষণা করতে পারে তাদের পর্যাপ্ত অধিকারের দাবিটুকু–

> "বলে, আপাতত আইন-কানুনই মানুন বাবুমশায়রা। বাড়িতে লুকোন জমি আমাদের দিন। আমরা খেয়ে বাঁচি। অন্যের নামে জমি রেখে সেই জমির ধান নিজের খামারে তোলা সরকারী নিয়ম নয়।"[৬]

এতদিনের একনায়কতন্ত্রী বাবুসম্প্রদায়কে হরি নায়েকই প্রথম প্রতাপকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আইনি সীমারেখাটিকে। সে-ই প্রথম অস্বীকার করতে পেরেছে বহমান বুর্জোয়াতন্ত্রের স্বীকৃতিকে। তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের তীব্রতায় জোরালোভাবে সে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে আইনি অধিকারকে। আবার শুধুমাত্র ভূমি-ক্ষমতাভোগী (মহাপাত্র, শতপথীদের মতো) বাবুদের নয়– তার প্রতিরোধ সুদখোর মহাজনদের বিপক্ষেও। যদিও মহাজন সম্প্রদায়ই সুদখোর বৃত্তির মধ্য দিয়ে চড়াসুদে কৃষককে ঋণগ্রস্ত করে, কৃষিজমির সীমারেখা বর্ধিত করে পরিণত হয়েছে বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিপতিতে তথা বাবুতে। এইভাবে হরি নায়েক বাবু-বুর্জোয়া-

মহাজন-সুদখোর-জমিদার এইসমস্ত মানুষদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধের আখ্যান গড়ে তুলতে চেয়েছে। মানুষকে যূথবদ্ধ শক্তিতে উদ্দীপ্ত করতে শিখিয়েছে–

> "...সুদ দেওয়া বা নেওয়ার জন্য মানুষের জন্ম নয়।"[৭]

এইভাবেই সমগ্র গোষ্ঠীর জননেতা হয়ে সে হরণ করতে চেয়েছে সুদখোর-মহাজন-বাবু এই সমস্ত শ্রেণিশত্রুদের প্রাণ, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদকে।

হরি নায়েকের স্ত্রীর মধ্যে ছিল নারীর প্রাকৃতিক, সহজাত বন্য লাবণ্য। ঠিক যেমন কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলাকে বন্য সৌন্দর্যের স্বাভাবিকতায় আলোকময় করে তুলেছিলেন। এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে বলবার প্রয়োজন যে, গল্পকার হরি নায়েকের স্ত্রীর দেহসৌষ্ঠবের লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে অভিব্যঞ্জিত করেছেন হরি নায়েকের স্বপ্ন-পৃথিবীর সঙ্গে। যে হরি নায়েকের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষকের ভূমির অধিকার-লব্ধ একটা উজ্জ্বল পৃথিবীর স্বপ্ন। হরি নায়েক স্ত্রীর সহজাত সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতাকেই ওই স্বপ্নের প্রতীক করে তুলতে চায়। তাই–

> "বউকে সে মাঝে মধ্যেই বলে, যেমন তুই তেমনি হবে জগৎ।"[৮]

এইভাবে বউয়ের শরীরে দেখা সৌন্দর্যে একটি স্বপ্ন-পৃথিবী গড়ার আত্ম-অভিলাষ নিয়ে সে ভূমি অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নেমেছে। কিন্তু হরি নায়েকের এই প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়ায় প্রযোজ্য হল সরকারি দমননীতিও। নকশাল আন্দোলন পর্বে সরকারি দমননীতি প্রযুক্ত ক'রে হরি নায়েককে কারাবন্দী করলে, পুরোনো শোষণতন্ত্রের ভিত আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এই প্রান্তিক জীবনভূমিতে। বলা ভালো, প্রশাসনিক সহায়তাই বাবুদের আবার শোষকযন্ত্রে পরিণত করেছিল। অত্যন্ত কূটনৈতিক প্রশাসনিক কার্যকারণ দেখিয়ে শুরু হল কৃষকদের জমি দখলের পুনর্যাত্রা। হরি নায়েকের অনুপস্থিতি প্রান্তিক, হতদরিদ্র মানুষগুলিকে আবার প্রোথিত করল অর্থনৈতিক শূন্যতার কবরে। সেইজন্য গল্পে পাই এই ব্যাখ্যা–

> "বাবু মহোদয়গণ দেশীয় অর্থনীতির ধারক ও বাহক। তাঁরা উন্নত প্রথায় চাষ না করলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে। ভূমির নয়, আসলে কৃষির সংস্কার চাই। গরীব হাড়-হাভাতেরা যে সব জমি দখল করে কর্ষণ করে, তা নিয়ে নাও। গরীব মানুষের না আছে অর্থের সংস্থান না আছে শিক্ষার আলো। তাদের দ্বারা জমি অপমানিত হবে।"[৯]

কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র ব্যক্তিজীবনে প্রশাসনিক ভূমি দপ্তরেরও যে সমস্ত শূন্যতা, দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন; 'ডাইন' গল্পে তারই একটা সাহিত্যিক রূপদান করলেন – এক শক্তিশালী সামাজিক দলিল হিসাবে।

আসলে নকশালপন্থী আন্দোলনের দমননীতিতে ভর করে প্রশাসন হরি নায়েককে বাঁধতে চাইলেও, কোনো বিশেষ আইনি ফাঁক তারা হরি নায়েকের বিরুদ্ধে তৈরি করতে পারেনি। ফলত হরি নায়েকের পুনরায় স্ব-ভূমে প্রত্যাবর্তন বিপর্যস্ত করেছিল বাবুদের স্বপ্নবিশ্বকে। পুনরায় বিধ্বস্ত করেছিল তাদের ক্ষমতাভোগী, বিলাসী যাপন পরিসরকে। এইভাবে সে তার চারিত্রিক দাপটে পুনরায় বাবুদের বাঘ হয়ে উঠল। হরি নায়েকের প্রতি সর্বাত্মক দমননীতি প্রয়োগের ব্যর্থতায় নিরাশ হয়ে বাবুদের মধ্যেও যেন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠল –

> "আধিভৌতিক কোনো শক্তি আছে ওর ভিতরে।"[১০]

তারপরেই তার উপস্থিতি ও প্রখর বলশালী প্রতাপ পুনরায় এই অঞ্চল থেকে অপসৃত করল বাবুদের সুবিধাভোগের সুগমতাকে। আসলে দীর্ঘকালব্যাপী এই জমি অধিগৃহীত করে স্ব-অধিকার ভোগের লোভ; বাবুদের বারবার চালিত করেছে নায়েক-বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করতে। তারা হরি নায়েককে স্থায়ীভাবে জেলবন্দী করার ঘুঁটি করে তুলতে চেয়েছে হরি নায়েকের বৌটিকেই। তার বৌটির গায়ে 'ডাইন' কলঙ্ক লেপনের মধ্য

দিয়ে দাবার চালটি দিতে চেয়েছে তারা। আবার এই 'জমিবাবু'দের জমিবিস্তারের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা এতটাই তীব্র যে, তারা জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য কাজে লাগায় ভৌগোলিক বিভাজনকে। বিহারের ভূগোলভূমিতে স্থাপিত তাদের জমিরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমি আইনের আওতাভুক্ত হয়না। কাজেই বিনা প্রতিবন্ধকতায় তারা বহাল রাখতে পারে তাদের সম্পত্তি সম্প্রসারণের নীতি। অবশেষে হরি নায়েকের এই প্রত্যাবর্তন ব্যাপক প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে সিংভূমবাসী সুদখোর দাতারাম সিংহের বিরুদ্ধেও। কৃষকদের চড়াসুদে আত্মসর্বস্ব হরণ করার প্রতিবাদে, হরি নায়েকের নেতৃত্বে যখন কৃষককুলের ন্যায্যদাবি বলিষ্ঠ হয়ে উঠল –

> "মানুষের যা যা গেছে সব ফেরত চাই। এতদিন জীবন রুদ্ধ হয়েছিল, জীবন ফেরত চাই।"[১১]

তখন সেই দাবির সামনে পা না ফেলে, দাতারাম পিছু হেঁটেছিল তাদের দাবির বিপ্রতীপে। সেই ঘটনারই ফলপ্রসূ রূপ দাতারাম সিংহের মৃত্যু তথা খুন হওয়া। আর সেইজন্য দাতারামের মৃত্যু-পরবর্তীকালে ভূমিহারা এই কৃষক জনজাতি নায়েকের অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতে না পেরে, পূর্ববর্তী বুর্জোয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় হয়ে ওঠে দারুণ ভীতিপ্রদ। তারা বলে–

> "নায়েক তুমি ধরা দিয়ো না। তুমি যদি ধরা দাও তাহলে এই কীর্তনিয়াশোলের মাটি, এই সুবর্ণরেখা নদী, এই জঙ্গল সব আবার বদলে যাবে। শতপথীবাবুরা হয়ে উঠবেন দাতারাম।"[১২]

আসলে গোটা সম্প্রদায়ের এই শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম এক লহমায় পর্যুদস্ত হয়ে যাবে নায়েকের আত্ম-সমর্পণে। কারণ যে হরি নায়েকের প্রচন্ড প্রতাপশক্তি বাবু সম্প্রদায়কে এতকাল বিরত রেখেছিল তাদের বুর্জোয়াবাদ থেকে;– সেটি তাহলে এক মুহূর্তে আরোপিত হয়ে যাবে এই ভূগোলভূমিতে। তারা হারাবে তাদের প্রতিবাদের ভাষা। তারা হারাবে জোরালো কৃষক বিদ্রোহের সুর, একটি যোগ্য নেতৃত্বদানকারী মুখ। আর পরিবর্তে পাবে সেই সংকীর্ণ, কোণঠাসা কূপমন্ডুক জীবন-বিবর! যেখানে ঠাঁই নিয়ে তাদের অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসেই কাটাতে হবে আজীবন।

যদিও গল্পের অন্তিম প্রেক্ষণবিন্দুতে এসে আমরা জানতে পারি, হরি নায়েকের মতো প্রতাপশালী কৃষকনেতার মৃত্যু সম্পন্ন হয়েছিল দাতারাম সিংহের বন্দুকহেলনেই। সেদিন রাতারাতি তার চার সঙ্গী নায়েকের মৃতদেহ বহন করে আনে। হরি নায়েকের বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে নায়েককে সুবর্ণরেখার তীরে কবরস্থ করা হয়। আর নায়েকের পলায়নবার্তার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে তারা গোপন রাখতে চেয়েছে নায়েকের সত্যিকারের মৃত্যু-সংবাদটিকে। কারণ এই নিঃস্ব, সর্বহারা মানুষগুলি অনুধাবন করতে পেরেছিল, নায়েকের অনুপস্থিতি আবার তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে অত্যাচারী মহাজনী শাসন। আসলে হরি নায়েকের দীর্ঘ নেতৃত্বে এই নির্বোধ মানুষগুলিও অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছিল গভীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের। এই ঘোষণাতে তারা যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল বলা চলে। নাহলে তাদের স্বাবলম্বী জীবনের দাবিতে গড়ে তোলা এতদিনের প্রতিরোধের প্রাসাদটি ধ্বস্ত হত একটি বার্তাবাণেই। এরকমভাবেই তারা কৃষকনেতা হরি নায়েকের মৃত্যু-উত্তীর্ণ কালেও বহমান রাখতে চেয়েছে কৃষক-স্বার্থ অনুসারী সেই প্রতিরোধের আখ্যানটিকে। মৃত্যু-সংস্কারকে উপেক্ষা করার মতো সামাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জমিজীবনের এ এক সুদূরপ্রসারী ও প্রতিরোধী আখ্যান রচিত হল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, হরি নায়েকের স্ত্রীর চরিত্রের ব্যক্তিত্বটি। সে একজন গ্রাম্য মহিলা। এত তত্ত্ব, আদর্শ, নকশালবাদের চেতনা তার বিন্দুমাত্র মস্তিষ্কগ্রাহ্য নয়। কিন্তু একজন গণনায়কের সার্থক সহধর্মিনী হিসেবে সে পরিচয় দিয়েছে যোগ্য নেত্রীর। হয়তো বা এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার বিপ্লববাদী স্বামীরই সান্নিধ্যপ্রসূত প্রতিফল। এইরকম গ্রাম্যসমাজ ও জীবনব্যবস্থায় একটি নারী; তার স্বামীর মৃত্যুর পরেও অস্বীকার করছে সামাজিক সংস্কারবোধ। সে বৈধব্য-সধব্যের সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে এই ভূমিজাতির আন্দোলনকে বহমান রাখতে চেয়েছে

স্বামীর মৃত্যু-পরবর্তী কালেও। এই নারীও নিঃসন্দেহে তার সামাজিক বিপ্লবে কৃষি আন্দোলনেরই জননেত্রী। যোগ্য নেতার যোগ্য স্ত্রী এই নারী, এই নেত্রী। হরি নায়েকের স্ত্রীরও সচেতন বৈপ্লবিক মন এটুকু বুঝে নিয়েছে যে, নায়েকের মৃত্যু তাদের সমগ্র কৃষকসমাজে ঘনিয়ে আনবে অন্ধকার ও হতাশার মেঘ। সে কিন্তু ব্যক্তিজীবনের নারী-সংস্কারকে উপেক্ষা করে গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষকস্বার্থের দায়রক্ষা করেছে। এই হিসেবে সে-ই হয়ে উঠল এই ভূমি আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী প্রকৃত উত্তরসূরি। হয়তো সে সরাসরি প্রতিবাদ করে কৃষকস্বার্থের দাবিকে বাবুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না ঠিকই; কিন্তু একজন নারী হয়ে তার সমাজবিপ্লবে সে এই কৃষকদের দাবি ও অধিকারের ধারাবাহিকতাটিকে বহমান রাখতে চেয়েছে। সেইজন্য চারজনের মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তি নদীর ধারে এসে নারীর সামাজিক সংস্কারজনিত বিধিনিষেধের দোহাই দিলে, তখনই সে উচ্চারণ করে ফেলেছে তার কৃষি বিপ্লবের বেদমন্ত্রটি–

> "আগে বাঁচি পরে পাপ, গাঁ বাঁচলে বড় পুণ্যি, শাখা সিঁদুর পরা থাকলি নায়েক মানুষের ভিতর বাঁচি থাকে, বাবুগণ ভয় পাবে, তদ্দিনে আর এক নায়েকের জন্ম হবে।"[১৩]

আমরা দেখি এই নারীটি তার জীবনে ডাইন কলঙ্কের মতো অপ-সংস্কারমূলক তকমা গায়ে মেখে নিয়েও স্বামীর ভূমি আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। সেই সঙ্গে স্বামীর বৈপ্লবিক আদর্শের দায়রক্ষা করেছে। জমিজীবনের দায়রক্ষা করতে গিয়ে একটি নারীর বিধবা হয়েও সধব্য সাজ ধারণ করার উদাহরণ বাংলা ছোটগল্পে নিতান্তই মৌলিক ও অভিনব। যদিও প্রখ্যাত নারীবাদী কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর 'অনাচার' গল্পেও সুভাষ কাকিমাকে বিধবা হয়ে সধবার বেশ ধারণ করতে দেখি। সেটা সম্পন্ন হয়েছিল শ্বশুরের তথা কোনো একক মানুষের প্রাণরক্ষার দায়ের প্রতি মুখ রেখে বা ব্যক্তিজীবনের মানবিকতার খাতিরে। কিন্তু 'ডাইন' গল্পে হরি নায়েকের বৌ তা করেছে গোষ্ঠীবদ্ধ ভূমি জীবনের স্বার্থকে বজায় রাখতে। জমি জীবনের প্রতিবাদী আখ্যানে নারীর অন্তত এইভাবে অংশগ্রহণ বাংলা সাহিত্যে খুবই মৌলিক, স্বকীয় ও অভিনব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় সমালোচক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অমর মিত্রের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত এই বক্তব্যটি –

> "অমর মিত্রের সবচেয়ে যে বৈশিষ্ট্যটা চোখে পড়ে তা হল নারী জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ।"[১৪]

সেই শ্রদ্ধা থেকেই তিনি এমন চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন। তবে 'ডাইন' গল্পটির অন্তিমে ও নামকরণে গ্রামজীবনের লোকসংস্কার ও ডাইন প্রথার বিশ্বাস বড় হয়ে উঠলেও; তাকে কিন্তু সর্বাত্মকভাবে চালিত করেছে কৃষক বিদ্রোহের অস্তিত্ব রক্ষার দায়। সেই জন্যই এই নারীটি ডাইন কলঙ্কের দাগ স্বেচ্ছায় গায়ে লাগিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ ভূমিজীবনের লড়াই-ই হয়ে উঠেছে গল্পটির মুখ্য চালিকাশক্তি। ভূমি জীবনের প্রতিরোধী আখ্যানই স্থাপিত হয়েছে গল্পটির কেন্দ্রীয় প্রেক্ষণভূমিতে। নারী জাতি যেখানে প্রথানুগ সংস্কারের প্রতি সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল, সেখানে একটা নারীই (হরি নায়েকের বৌ) সামাজিক সংস্কার ও প্রথাকে ভেঙে রচনা করে দিল ভূমি সংগ্রামের একটি সামাজিক দস্তাবেজও। এইভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোড়কেও গল্পটিতে সংযোজিত হল একটি অভিনব সমাজ বিপ্লবের সুর, সামাজিক নব্য পরোয়ানা। আর সর্বোপরি হরি নায়েকের নেতৃত্বাধীন কৃষক পরিমণ্ডলও তাদের স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে চাওয়ার সতেজ অস্তিত্বে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

আসলে সাহিত্যিক শিল্পী হিসেবে অমর বাবুর দায়বদ্ধতা কেবল সাহিত্য রচনার কলাকৈবল্যবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি হরি নায়েকের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ভূমিহীন মানুষগুলির ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের যেন গুরু দায় রক্ষা করলেন। গল্পে নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রভাবসম্পৃক্ত কৃষিজীবনের প্রতিরোধী আখ্যান গড়ে তুললেও, লেখক কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলচিহ্নের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেননি কোনোদিনই। বরং

রাজনৈতিক জগতের ভন্ডামি ও স্বার্থসর্বস্বতা তাঁকে রাজনীতিবিমুখ করে তুলেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা গ্রাম থেকে কলকাতার নগরজীবনে এসে হয়েছিলেন আগন্তুক। তাঁদের আশৈশব বেড়ে ওঠা গ্রামচেতনা থেকে তাঁরা গ্রামজীবনকে একরকমভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু অমর মিত্র, সমীর রক্ষিত প্রমুখ কথাকাররা শহর থেকে গ্রামে হয়ে পড়েছিলেন আগন্তুক। চাকরি বা জীবিকাসূত্রে গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁদের গ্রামজীবনকে পুনরাবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। এভাবে তাঁরা গ্রামজীবনকে অন্বিষ্ট করে বহু ছোটগল্প উপহার দিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে। অমর বাবুর 'ডাইন' গল্পটিও মূলত পুনরাবিষ্কৃত ভূমি জীবনের দস্তাবেজ হয়ে উঠেছে। এমনভাবেই কৃষক জীবনের প্রতিরোধ, ভূমি অধিকারের দাবি অমর মিত্রের গল্পে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা পেল। গল্পকার অমর মিত্র প্রান্তিক, 'নিম্নবর্গীয়' (subaltern) সমাজের জীবন সংগ্রামের দলিলটিকে রূপ দিলেন তাঁর পূর্বজ কথাশিল্পীদের (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর) মতোই। কিন্তু তা রূপ পেল স্বতন্ত্র ও মৌলিক চেতনায়, নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে। প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ গ্রামীণ প্রবাসজীবনে থাকা অবস্থায় অমর বাবুর বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর, চেকভ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি প্রমুখ দেশি-বিদেশি লেখকদের কথাসাহিত্য পাঠ ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাই যে তাঁকে 'ডাইন' গল্পের মতো প্রতিবাদী আখ্যান রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল, তা বলা চলে। আর পূর্বজ কথাসাহিত্যিক হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীর লেখা প্রান্তিক জীবনের সংগ্রামী আখ্যান অমর বাবুর সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুঘটক হয়ে কাজ করেছে। ছয়ের দশক থেকেই কথাকারদের রচনায় বড় হয়ে উঠছিল স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। গল্পের 'কথনরীতি' (Point of View), ভাষারীতিকেও তাঁরা ভেঙেচুরে গড়ছিলেন ঐতিহ্য বহির্ভূত হয়ে। 'ডাইন' গল্পের 'কথনরীতি'তেও লেখক সেই প্রথাভাঙা প্রতিরোধকে তুলে ধরতে পারেন। এইভাবে গল্পের ভাষারীতিতেও তিনি হয়ে ওঠেন অভিনব ভাষাশৈলীর উপস্থাপক। সেই প্রথাভাঙা প্রত্যয়েই তিনি 'ডাইন' গল্পে গড়ে তুলতে পারেন স্বপ্নভঙ্গের বিপ্রতীপে দারুণ সামাজিক প্রতিবাদ, ঠান্ডা যুদ্ধের মতো এক স্নায়বিক বিপ্লব। ফলত সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অস্থিতাবস্থা- সবই ছুঁয়ে গেল গল্পের পরিধিকে। সেই সময়ের কথাকারদের মধ্যে প্রথা ভাঙার ব্রত বড় হয়ে উঠছিল বলেই অমরবাবু গল্পের 'চরিত্রায়নে' (Characterization) হরি নায়েকের মধ্য দিয়ে গড়ে তুললেন এক প্রথাবিরোধী বৈপ্লবিক আখ্যান।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, অমর মিত্র 'ডাইন' গল্পের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাভোগের বিরোধী আখ্যানকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করে তুললেন প্রান্তিক কৃষক বিপ্লবের প্রশ্বাসবিন্দুতে, এক মৌলিক শিল্পচেতনার প্রতিক্রিয়ায়। এইভাবেই অমর বাবুর পূর্বজ, সমকালীন ও উত্তরকালীন একাধিক কথাকার তথা অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, গুণময় মান্না, সমরেশ বসু, দিব্যেন্দু পালিত, সমরেশ মজুমদার, মহীতোষ বিশ্বাস, সাধন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখ সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসের পৃষ্ঠা এত জোরালোভাবে দখল করেছে মাটিমাখা মানুষগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার গণ সংগ্রাম। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন জুড়ে এই ভূমিজাতির কথা। সেকাল থেকে একালে, এই মাটিকেন্দ্রিক মানুষের লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি ও রেখাপথটি হয়তো বদলে গেছে দেশ-কাল-সময়ের বিবর্তনের সূত্র ধরে। কিন্তু কৃষক জীবনের এই লড়াই থামেনি আদৌ; তা থামেও না। মাটির ওপর আধিপত্যকামীরা চিরকালই চাইবে আপন শাসনকে কায়েম রাখতে। পক্ষান্তরে, মাটির ওপর নির্ভর করে দিনপাত করা শ্রমজীবী মানুষগুলো চাইবে আপন অস্তিত্বের স্বাধিকারটুকু। আর পৃথিবীর ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে কৃষক ও আধিপত্যবাদীদের দ্বন্দ্বের রেশ তার আপন গতিপথে বইবে এক প্রবহমান রূপ নিয়ে। সেখানেই হরি নায়েকের মতো একাধিক জননেতার ব্যক্তিত্বে সর্বহারা মানুষরা শক্তি পাবে ঘুরে দাঁড়াবার। ইন্ধন পাবে প্রতিরোধের ইতিকথা গড়ে তোলবার। মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্থায়ী কর্তৃত্ববাদই এইভাবে জন্ম দেবে শাশ্বত প্রতিরোধী

আখ্যানমালার। এখান থেকেই শুধু বাংলা নয়, সারা পৃথিবীর সাহিত্যই অর্জন করবে ভূমি-জীবনকেন্দ্রিক মানুষের প্রতিরোধ-গাথার উত্তরাধিকার। আর সেই খাতেই সমৃদ্ধ হবে আমাদের একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যধারাও।

তথ্যসূত্র:

১। মিত্র, অমর। 'অলীক এই জীবন' (ভূমিকা)। মিত্র, অমর। শ্রেষ্ঠ গল্প। করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. XVI.

২। মিত্র, অমর। 'ডাইন'। মিত্র, অমর। শ্রেষ্ঠ গল্প। করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৭।

৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। 'সকলের গান' কবিতা। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ১৬।

৪। মিত্র, অমর। 'ডাইন'। মিত্র, অমর। শ্রেষ্ঠ গল্প। করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৯।

৫। তদেব, পৃ. ১৮।

৬। তদেব, পৃ. ১৮।

৭। তদেব, পৃ. ১৮।

৮। তদেব, পৃ. ১৯।

৯। তদেব, পৃ. ১৯।

১০। তদেব, পৃ. ২০।

১১। তদেব, পৃ. ২১।

১২। তদেব, পৃ. ২২।

১৩। তদেব, পৃ. ২৩।

১৪। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। 'অমর মিত্রের গল্প'। সামন্ত, সুবল। সম্পাদনা। বাংলা গল্প ও গল্পকার, ৩য় খণ্ড। এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা।

২। ঘোষ, বিজিত। সম্পাদনা। নকশাল আন্দোলনের গল্প। পুনশ্চ, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা।

৩। দাস, অরূপকুমার। ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১২, কলকাতা।

৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটোগল্প: সময়ের শিল্প। এবং মুশায়েরা। প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা।

৫। রায়, অলোক। সম্পাদনা। সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য। সাহিত্যলোক, সংশোধিত মুদ্রণ, মার্চ ২০১৫, কলকাতা।

৬। ঘোষ, প্রসূন। বাংলা ছোটোগল্প: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। আশাদীপ, প্রথম প্রকাশ, মে ২০২৩, কলকাতা।

৭। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা।

৮। চৌধুরী, কমল। সম্পাদনা। ডাইনি। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, কলকাতা।

৯। চক্রবর্তী, সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, কলকাতা।